# সামাজিক প্রয়োজনে যদি শিক্ষা হয় তাহলে এই প্রয়োজন ধারণ করা ছাড়া শিক্ষিত মানুষ হওয়া অসম্ভব

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ: ০১৬৮০১৭৯৭৯৪, ০১৯১২৬৬৮৩৩৮; ই- মেইল: studentfront1984@gmail.com

প্রকাশকাল: জুন ২০২০, মূল্য: ১০ টাকা

# সামাজিক প্রয়োজনের জন্য যদি শিক্ষা হয়, তাহলে এই প্রয়োজন ধারণ করা ছাড়া শিক্ষিত মানুষ হওয়া অসম্ভব

*মুবিনুল হায়দার চৌধুরী*

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আয়োজিত এই শিক্ষা কনভেনশনের সভাপতি এবং আলোচক অতিথিবৃন্দ, সারাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি বন্ধুগণ, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি খুব বেশি কিছু বলতে পারব না।

বিপ্লবী পার্টির একজন সংগঠক হিসেবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ নিয়ে আমাদের একটা পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক এবং এর সাথে যুক্ত করে একই ধারার, একই সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমে যাতে দেশের সমস্ত ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে–তাই আমরা চাই। কারণ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিভিন্ন রকম হতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার এই মূল ভিত্তির উপর আলোচনা করার আগে দেশের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিদেশি শাসকদের বিতাড়িত করে এই দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান আমল এমনকি ব্রিটিশ আমল থেকেই মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা কিংবা আধুনিক কালে উন্নতভাবে জীবন-যাপন করার যে কথা শিক্ষিত মানুষরা জানে, যেসব কথা দেখে-শুনে গরিব মানুষদের মধ্যেও একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, তার সাথে মিলিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বুঝতে হবে।

অর্থনৈতিক দিকসহ সমস্ত দিকে পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করেছিল, এক দেশের কথা বলে বিভ্রান্ত করেছিল। কিন্তু

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মানুষ বুঝতে পারল যে, তারা আমাদের শোষণ করছে। অতীত থেকেই যে ধর্মীয় আবেগ ও চিন্তার দ্বারা এদেশের মানুষ প্রভাবিত ছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ-পাকিস্তানিরা ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনার বিস্তার ঘটিয়েছিল। ফলে যেখানে ভারতবর্ষ একটা দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে পারত, সেটা পারল না। একইসাথে তদানীন্তন কালে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক চিন্তা, বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা ছিল না। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা 'divid and rule'–এই নীতিতে দেশ শাসন করতে পেরেছিল। এ সকল সীমাবদ্ধতার কারণে যে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, রাষ্ট্র পত্তনের পরেই তা আর কার্যকর থাকেনি। একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই মানুষের ভাবাদর্শ অর্থাৎ শিক্ষা-সংস্কৃতি-নৈতিকতার উপর কর্তৃত্ব করে। ফলে যে উদীয়মান, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা তদানীন্তনকালে সমাজ জীবনের উপর ও স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাব রেখেছিল, তাদের নেতৃত্বে সংগ্রাম হওয়ায় যে দুর্বলতাগুলো তাদের থেকে গিয়েছিল; তা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পরও থেকে গেল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যেহেতু গড়ে উঠেছিল মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে, তার কূপমণ্ডূকতাকে উস্কে দিয়ে, তাই পত্তনের পর ধর্ম ও তার নীতি-নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে থাকে। এই পরিকল্পনার অযৌক্তিক-অনৈতিক প্রভাব, উপরন্তু পাকিস্তানি বর্বরতা–এসব কারণে এদেশের মানুষ ধীরে ধীরে আন্দোলন শুরু করে। কোনো দেশেই প্রথমেই সমগ্র সমস্যা নিয়ে আন্দোলন শুরু হয় না। আমাদের দেশেও হয়নি। এখানে লড়াই শুরু হয় ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষা, আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মানবিক বিকাশের প্রয়োজনের জন্যই এই ভাষা। তাই ভাষার উপর আক্রমণে এদেশের লোক প্রতিবাদ করেছে, রুখে দাঁড়িয়েছে। আবার ভাষা নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটিও এসেছে। আমরা জানি, অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর অন্য সমস্ত কিছু আবর্তিত হয়। ফলে পাকিস্তানি শাসকদের সাথে যে অর্থনৈতিক বিরোধ, তা-ই চিন্তা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরোধ তৈরি করল। এটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি রচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এদেশে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে ছাত্রদের বিরাট ভূমিকা সবসময়ই ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাঁরা এই ভূমিকা পালন করেছে। পরাধীন দেশে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে তাঁদের এই লড়াইয়ের সময় যেহেতু ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, তাই তার বিরুদ্ধে যৌক্তিক-নৈতিক লড়াই করার মধ্য দিয়েই এদেশের বুকে গণতান্ত্রিক-সেক্যুলার চিন্তার উন্মেষ হতে থাকে। সেই সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু অস্বীকার করতে পারেনি। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়কালে বাঙালিকে যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিকার হতে হয়েছিল, তা থেকে এই অঞ্চলের বাঙালিরা মুক্ত হতে থাকে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একটা প্রবল আকঙ্ক্ষা গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম গড়ে তোলেনি। সর্বহারা গরিব কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের কথা বলে, সাম্যবাদের কথা বলে এরকম রাজনৈতিক দল থাকলেও তারা কোনো ভূমিকা পালন করেনি। বুঝতেও পারেনি যে, এটা ছিল স্বাধীনতার আন্দোলন। যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল একটি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে, সেটাকেও তারা একটা ঐতিহাসিক ও যুক্তিসঙ্গত আন্দোলন মনে করেছিল। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে, ওটা ছিল ভুল।

ফলে ঐতিহাসিকভাবেই পাকিস্তান সৃষ্টির অসারতা প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো যে, শুধু ধর্মের মিল থাকলেই জাতি গঠিত হয় না। তাই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত আন্দোলন ধীরে ধীরে পাকিস্তান বাতিল করার দিকে নিয়ে গেল। এই লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে কী ভয়ঙ্কর-ভয়াবহ-মর্মান্তিক পরিণতির মধ্য দিয়ে এদেশ পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত হলো! এভাবে আরও একবার মুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশদের কাছ থেকে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসার জন্য নানা ধরনের যে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত হয়েছে, সেগুলিরই outcome হিসেবে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান যখন তৈরি হলো এবং সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে আমাদের এখানে যে আন্দোলন গড়ে উঠল, সে আন্দোলনই স্বাভাবিকভাবে সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক চিন্তা নিয়ে এলো। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা এই চিন্তাগুলোকে ধারণ করতে পারেনি। প্রশ্ন হলো, এর কারণ কী? রাজনৈতিক সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী লোকেরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঝাণ্ডাটা কেন ফেলে দিলেন?

এর ঐতিহাসিক কারণ হলো, ইতিহাসে আমরা যখন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চিন্তাগুলো করছি, তার উন্মেষ ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দিতে। একটি বৈপ্লবিক সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এই চিন্তাগুলো এসেছে। সেই সময়ে মধ্যযুগীয়-কাল্পনিক-অপ্রমাণিত-কুসংস্কারগ্রস্ত চিন্তার বিরুদ্ধে খানিকটা বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা, যান্ত্রিক বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনা মানুষের মধ্যে operate করেছে। ধীরে ধীরে মানুষের সমাজে আরও উন্নত চিন্তা অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তার জন্ম হয়েছে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামেও জনগণ ধর্মভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থার অবসান চেয়েছিল। এ জন্যই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নর-নারী সকলে প্রাণ উৎসর্গ করেছিল দেশ স্বাধীন করার জন্য। কিন্তু নেতৃত্বের শীর্ষে যারা ছিলেন, তারা জনগণের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেনি। এক ধরনের pragmatic জায়গা থেকে, জনগণকে রিহ করার জন্য, শিক্ষিত তরুণ-যুবকদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যুক্ত করার জন্য খানিকটা গোঁজামিল দিয়ে এগুলো মেনে নিয়েছে। এখানে সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের কথাও বলা হয়েছিল। এগুলো সবকিছুর মধ্যেই অনেক deception ছিল। তদানীন্তনকালে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের প্রবল জয়-জয়কারের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ধারণা বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এই আবেগকে কাজে লাগানো বুর্জোয়াদের খুব প্রয়োজন ছিল। বুর্জোয়ারা নানাভাবে ইউরোপের দেশে দেশে এরকম করেছে, আমাদের দেশেও সেইসব স্লোগান নিয়ে এসেছে। কিন্তু এগুলো তাদের বিশ্বাস নয়, মানুষকে ঠকানোর কৌশল মাত্র। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর একে পদদলিত করতে তাদের মুহূর্তও লাগেনি।

একটা বিষয় বোঝা দরকার, সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক এই চিন্তাগুলোর যে শ্রেণিগত প্রয়োজন, সেটা আজকের যুগে কেবল সর্বহারা শ্রেণিই ধারণ করে। বুর্জোয়া শ্রেণি যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ধারণ করতে পারেনি, তা বোঝাতে আমি তখনকার প্রভাবশালী কিছু মানুষকে সবধহ করছি না। যে শ্রেণিটি স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলো, তাকেই বোঝাতে চাইছি। ওই মানুষগুলো ছিলেন সেই শ্রেণিরই প্রতিনিধি। আজও তারাই continue করছে, শুধুমাত্র পরিচালকদের পরিবর্তন হয়েছে।

ফলে স্বাধীনতার পর এতগুলো বছরেও শাসকদের সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক-বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো কোনোভাবেই সম্ভব হলো না। শুধু তাই নয়, এরকম একটি শোষণ-বৈষম্যের সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য পিছিয়ে পড়া-কুসংস্কারগ্রস্ত-কূপমণ্ডূক চিন্তার ব্যাপক বিস্তার শাসকদের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা এসবকে উৎসাহিত করেছে। এখনো সেই প্রয়োজন। এই বিষয়গুলো আমাদের ছাত্র-যুবকদের ভাবতে হবে।

লেখাপড়া কীসের জন্য শেখা? দেশের কোনো না কোনো ক্রিয়া, তার সামাজিক অবস্থানকে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু দেশের অবস্থাই যদি সঠিকভাবে না জানি, তাকে আমি service দেব কীভাবে? আমরা এমনভাবে শিক্ষিত হচ্ছি যেন, শিক্ষার্জনটাই হলো ব্যক্তিগত বিষয়। শিক্ষার্জন আবার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে হতে পারে নাকি? এর কোনো উপায়ই নেই। একজন ব্যক্তি যখন যেকোনো ক্ষেত্রে দক্ষ হয়, তখন তার প্রয়োগ হয় কোথায়? সমাজেই তো হয়। তাহলে সামাজিক প্রয়োজনের জন্যই তো শিক্ষা। সামাজিক প্রয়োজনের জন্য যদি শিক্ষা হয়, তাহলে একজন শিক্ষিত মানুষের কীভাবে গড়ে ওঠা উচিত? সমাজের প্রয়োজনকে ধারণ করা ব্যতিরেকে শিক্ষিত মানুষ হওয়াই অসম্ভব।

একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন, দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ছাত্র-যুবকদের বিরাট ভূমিকা থাকলেও স্বাধীনতার পর সমাজ-সচেতনতার যে সংগ্রামটা করার দরকার ছিল, যে কথাটা সাংস্কৃতিক-নৈতিক দিক থেকে শিক্ষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বারবার এসেছে, তার একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা সমাজ অভ্যন্তরে দাঁড়ায়নি। কারণ, এক শাসকদলের পর আরেক শাসকদল ক্ষমতায় এসেছে। মানুষ আরও নির্মম শোষণের শিকার হয়েছে। মানুষ বিক্ষোভ করেছে, রাস্তায় নেমেছে। কিন্তু সমাজ সচেতনতার সে কাজটি আর হয়নি। এখন তো সমাজের ভয়াবহ অবস্থা। যারা সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য জীবন হাতে নিয়ে লড়েছিলেন, তাদের এখন ঘুম বন্ধ হয়ে যাবার মতো সামাজিক অবস্থা তৈরি হয়েছে। আমাদের ছাত্রদের কি এই চিন্তাগুলো এইভাবে পীড়ন করে? এইসব প্রশ্নগুলো আজকে ভাবার সময় এসেছে।

ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানকে অপসারিত করে বাঙালি মুসলমানদের ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্র চালু হলো। যদিও কোটি কোটি বাঙালিদের সাথে এর

কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণ অবস্থার শিকার। তারা কিন্তু এগুলো চায়ওনি, আবার কীভাবে প্রতিরোধ করবে তা-ও জানে না। তাই আজ অশিক্ষিত বিশাল যে জনগোষ্ঠী আমাদের বন্ধুরা, আমাদের ভাইয়েরা, কৃষক-শ্রমিক তাদের জন্য, এতবড় স্বাধীনতার সংগ্রামকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষিত মানুষদের আবার সেই আকাঙ্ক্ষার পক্ষে দাঁড়াতে হবে। সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শিক্ষার প্রসঙ্গটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

'সেক্যুলার শিক্ষা' কথাটার মানে কী?–এর মানে হলো ইহজাগতিক পার্থিব শিক্ষা। বস্তুর অভ্যন্তরে যে নিহিত নিয়ম, তাকে যথাযথভাবে জানার শিক্ষা। বিজ্ঞানের হাতিয়ার ছাড়া এভাবে জানা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। পারলৌকিক শিক্ষা কোনো মানবিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে না। একটা সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দর্শনের দিক থেকে ধর্ম হলো নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ ধর্মে বিশ্বাস করলে তার অনুভূতি বা বিশ্বাসের উপর কোনো অপমান-অবমাননা করার প্রশ্ন নেই। রাষ্ট্র নাগরিকের ধর্ম পালনে সহায়তা কিংবা বিরোধিতা–কোনোটাই করবে না। রাষ্ট্র সম্পূণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ হবে এবং ইহজাগতিক-পার্থিব যে ক্রিয়াকলাপ, সে সংক্রান্ত ব্যাপারে নীতি-নৈতিকতা ঠিক করবে। কিন্তু আমাদের দেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা যুক্ত, ওই যে জিয়াউর রহমান, যিনি সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' যুক্ত করলেন, এরশাদ 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' চালু করলেন–এগুলো একেকটা ঘটনা ঠিক, তাদেরকে দেশের মানুষ চেনেও; কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন, তারাও পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক-প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি ও তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে বসবাস করলেন, তাকে নিয়েই চললেন, নানাভাবে তাকে উসকে দিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা, এখানে একজন শিক্ষক বলার সময় এর বিরুদ্ধে বললেন, এই শিক্ষাকে তো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছেন। অন্য যে কোনো অত্যাচারী শাসকদের তুলনায় বেশি সহায়তা করছেন। এরই মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির সাথে নানা জায়গায় ব্যাপক compromise করেছেন। অর্থাৎ এদেশ বুর্জোয়ারা যখনই চালাবে, দেশটা ধর্মভিত্তিকই থাকবে। কারণ তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এটা প্রয়োজন। মানুষের এত আত্মত্যাগের কোনো মূল্যই নেই এই শাসকদের কাছে। দেশের এই অবস্থায় ছাত্ররা যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার কথা পুনরায়, বারে বারে

খেয়াল করেন, তাহলে বুঝবেন–আপনাদের কী কর্তব্য। সেই সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক শিক্ষা এবং তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদের এক মরণপণ সংগ্রাম করতে হবে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলি। ইউরোপে যখন রাজা-রাজড়ার শাসন তথা সামন্ততন্ত্রকে পরাস্ত করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের বুর্জোয়া বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, সেই সময়ই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে সমাজের মধ্যকার ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, নানা ধরনের কুসংস্কার ও অশিক্ষা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে উঠেছিল গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্লোগান। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সেই গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবি উঠেছিল এবং তা ছিল স্বাধীনতার অন্যতম দাবি। গণতান্ত্রিক মানে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ; স্ত্রী-পুরুষ; ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা। হাজার বছর ধরে মানুষের অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান পড়-ordinate করে, generalise করে তত্ত্বজ্ঞান তৈরি হয়েছে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। পূর্বপুরুষদের এই সমস্ত কিছুর উপর অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। এখানে জাতি-ধর্ম বলে কিছু থাকতে পারে না। এই ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ–

প্রথমত, গণতান্ত্রিক শিক্ষা মানে হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শিক্ষা হলো বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, যা সমস্ত রকমের ধর্মীয় সংকীর্ণতা-কুসংস্কার-সাম্প্রদায়িক মনোভাব-আঞ্চলিকতা থেকে মুক্ত এবং উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাসম্পন্ন।

তৃতীয়ত, শিক্ষায় গণতন্ত্রের অন্যতম তাৎপর্য হলো জ্ঞানচর্চার আয়োজন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা–দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষা পরিচালিত হবে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এবং শিক্ষাজগতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থার মাধ্যমে। সরকার অর্থ বরাদ্দ করবে, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক বা অন্য কোনো রকমের সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে শিক্ষা মুক্ত থাকবে।

কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সকলের শিক্ষার অধিকার আজও

পরিহাসের বিষয়। এমনকি প্রাথমিক স্তরেও শিক্ষার অধিকার যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলেও দেখা যাবে, এখনও সকলের ন্যূনতম শিক্ষাটুকুও নিশ্চিত হয়নি। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে স্বাধীনতার পূর্বাপর সকল সরকারের বক্তব্যই একরকম। তাদের বক্তব্য হলো–'উচ্চশিক্ষা সবার জন্য নয়', 'সকলকে কেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, গবেষক হতে হবে?' অনেক সময় উপায়হীনতা আমাদের এমন করে যে, আমাদের কাছেও কথাগুলো ঠিক মনে হয়। আমাদের বলা হয়, যারা মেধাবী তারাই কেবল এগুলো হতে পারবে। কে মেধাবী? এখন কি মেধাবী বোঝার কোনো উপায় আছে? যে হারে তারা পাশ করাচ্ছে তাতে মেধাবী বোঝার উপায় কী? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালু করা হচ্ছে নাইট শিফট। যেখানে ভর্তির জন্য মেধা বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য টাকা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দরিদ্র-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা উপযুক্ত পরিচর্যাসহ অন্যান্য সুযোগ না পাওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে আসতে পারছে না। যারা আসছে, তারা কঠোর পরিশ্রমী, নিবেদিত প্রাণ। এরা বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা ছোট অংশ। এখন শিক্ষায় যদি টাকার লড়াই পরিচালিত হয়, তাহলে শিক্ষিত হবার আর কোনো সুযোগ তার থাকবে না। ধনীর ছেলেরা পড়বে টাকার জোরে, আপনারা অনেকেই তা পারবেন না।

WTO, IMF, World Bank-এগুলো সবই পুঁজিবাদী অর্থনীতি পরিচালনা করার একেকটি সংস্থা। এদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো শিক্ষাসহ সবক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করছে। আমেরিকার দিকে তাকান, সেখানে নতুন কল-কারখানা হতে পারছে না, অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে না। অস্ত্র উৎপাদনই হয়ে গেছে আমেরিকার অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র। শুধু উৎপাদন করলেই তো হবে না, অস্ত্র release-ও করতে হবে। এই প্রয়োজনে তারা ইরাক দখল করল, লিবিয়াকে ধ্বংস করল, সিরিয়া ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে। এখানে যাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা দাঁড়াচ্ছে, তারাও কিন্তু আমেরিকারই creation। একটা অদ্ভুত ঘটনা কি–পুঁজিপতিদের মধ্যে বা তাদের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণির মধ্যে কোনোদিনই absolute unity হবে না। কারণ এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অর্থনীতি বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা সবসময় জন্ম হতে থাকবে। ফলে যাদেরকে একদিন কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য, গণতান্ত্রিক শক্তিকে দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা আইএস, আল-কায়েদা, তালেবান হিসেবে সৃষ্টি করেছিল, এখন যেহেতু এই

শক্তিগুলো arms power হিসেবে appear করেছে, তখন আবার তাদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই দেশগুলো তেলের ক্ষেত্র। আমেরিকা সবকিছুকে দখল করার জন্য এটা করেছে। এভাবে বিশ্বপুঁজিবাদ ভয়ঙ্কর সংকটে নিপতিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দিতে যে অবাধ বিকাশ ঘটেছিল, তা এখন আর নেই। নিত্য-নতুন কলকারখানা তৈরি হচ্ছে না, সস্তা শ্রম লুট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে ঘুরছে। এখন সেটা আরও ব্যাপক রূপ নিয়েছে। নিজের দেশে কলকারখানা চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যা উৎপাদন হয়, তা শ্রমিক-সাধারণ মানুষ কিনতে পারে না। তখন সস্তায় উৎপাদনের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা গরিব দেশগুলোতে আসে। এর ফলাফলে এক সময় মনে হয়, গরিব দেশগুলো যেন উন্নত হচ্ছে। আসলে উন্নতি কিছু হয় না। কেননা অর্থনীতির মূল ভিত্তিটা থাকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। মুহূর্তে তলিয়ে দিতে পারে একটা দেশকে, ধ্বংস করে দিতে পারে। সুনামি সৃষ্টি করে দিতে পারে বাংলাদেশের মতো দেশের অর্থনীতিতে। এ কারণে বুর্জোয়ারা একজন আরেকজনের উপর প্রবলভাবে ফবঢ়বহফ করে। এই মুহূর্তে পুঁজিবাদ এখন ব্যবসার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সেবাখাতসমূহকে অবলম্বন করেছে।

এখন শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গে আসি। আমরা এমন একটা সময়ে এসেছি, যখন একজন সহায়-সম্বলহীন মানুষও তার সন্তানের লেখাপড়ার কথা ভাবে। আবার জীবন ধারণ করতে গেলে কিছু লেখাপড়া করতেই হবে। কেননা কোনো না কোনো দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবন পরিচালনা করতে হয়। সমাজ তো দায়িত্ব নেয় না, নিজেরটা কোনোমতে চালিয়ে নেওয়ার জন্য হলেও পড়াশুনা শিখতে হয়। আবার ফাটকা কারবার, এটা-ওটা করার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যতটুকু বিকাশ ঘটেছে, তারাও শিক্ষা গ্রহণ করতে আসছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে ভীষণ প্রতিযোগিতা। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষকে ঠকিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে অঢেল টাকা জমেছে। আরও বেশি মুনাফা করার জন্য তারা এই টাকা কোথায় বিনিয়োগ করবে? এজন্য তারা শিক্ষাখাতকে বেছে নিয়েছে। লুটপাটকারী, দুর্নীতিবাজরা নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শপিং মলের মতো। এখান থেকে যারা বের হচ্ছে,

তারা কীভাবে শিক্ষিত হচ্ছে? তাদেরকে শিক্ষিত করা হচ্ছে 'কর্মমুখী', 'উৎপাদনমুখী'–এসব শিক্ষার কথা বলে। কারিগরি শিক্ষার সাথে মানবিক শিক্ষা না দেওয়ার কারণে সাহিত্য শেখা, ভাষা আয়ত্ত করা, শেক্সপিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ বা বার্নার্ড 'শ থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সবকিছু জানবার যে প্রবল আগ্রহ যৌবনে তৈরি হয়, যাকে কাজে লাগিয়ে যৌবনের শক্তি-সামর্থ্যকে নৈতিকভাবে প্রবাহিত করা যায়–তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

আবার কারিগরি শিক্ষার সাথে technical অর্থে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু তাতে বিজ্ঞান শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা হচ্ছে না। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠেছিল বৈজ্ঞানিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে। পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির সমন্বয়ও বিষয়গুলির আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। জ্ঞানচর্চা যেহেতু সমগ্র মানব সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির সাধনা, আবার ব্যক্তি তার জ্ঞানচর্চাসহ সমগ্র অস্তিত্বের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল, তাই মূল্যবোধ, মানবিকতা সবসময়েই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা, সাহিত্যের উপর সে কারণেই শিক্ষার একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হতো। বর্তমানে শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত সিলেবাসে এই সমন্বয়কে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে তথাকথিত স্পেশালাইজেশনের কথা। যে ছাত্র বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তি অধ্যয়ন করবে, এমনকি বাণিজ্যের কোনো বিষয় পড়বে, তার সাহিত্য পড়ে কী হবে? ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের নীতি এরকম। অর্থাৎ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য বাণিজ্যিক ইংরেজি, প্রযুক্তির জন্য প্রযুক্তিগত ইংরেজি শিখলেই হলো। অর্থাৎ জ্ঞান বিকাশের সুসংহত প্রক্রিয়াটিই ভীষণভাবে মার খাচ্ছে।

এই co-ordinated knowledge, এটা এককালে বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে ছিল–জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহার মতো বড় বড় বিজ্ঞানী তৈরি হয়েছিল। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, দেশের মানুষ সেরকম নাম আজ আর বলতে পারছে না। এই স্ট্র্যাচারের মানুষ দেশে নেই। বলতে চাইলেও হাতড়ে হাতড়ে পায় না কিছুতেই। তাঁরা কিন্তু ভাঙাচোরা ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। আইনস্টাইন সত্যেন বোসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার উপযুক্ত মনে করতেন। সত্যেন

বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গৌরববোধ থাকতে হবে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের! জগদীশ বোস আমাদের বিক্রমপুরে জন্মেছিলেন। অথচ কত জন জানে এই কথা? কোনো চর্চা আছে এদেশে? পাকিস্তান আমাদের কত ক্ষতি করে দিয়েছে, আপনারা বুঝতে পারছেন? সাম্প্রদায়িক চিন্তা যদি আমাদের মাথাকে এভাবে চেপে ধরে রাখে, তাহলে আমরা কি এসব বড় মানুষকে, বড় চরিত্রকে বুঝতে পারব? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিক্রমপুরে, আজকের মুন্সিগঞ্জে জন্মেছিলেন। কোনো গৌরববোধ আছে? কিছু শিক্ষিত লোক হয়তো কষ্ট পায়; মনে করে, থাকলে ভালো হতো, ঠিক হতো। কিন্তু তা নেই তো। কেন নেই? আসলে সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক চিন্তা আনবার জন্য যে প্রবল সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেটা হয়নি। সেটা না করলে এই পরিবেশ পাল্টাবে না। একটু সেক্যুলার, একটু গণতান্ত্রিক, খানিকটা ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন–এরকম জগাখিচুড়ি হয়ে কি বড় কোনো কিছুকে ধারণ করতে পারবেন? পারবেন না, পারবেন না। আমার উপর ক্ষেপে যাবেন না। আমি বোঝার জন্য বলছি। মনের মধ্যে হচপচ নিয়ে, পাঁচমিশালী মন নিয়ে কোনোদিনই গৌরববোধ দাঁড়াবে না।

এখন আমি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলব। ১৯৮৪ সালে ছাত্রলীগের ধারা থেকে ব্রেক করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গড়ে ওঠে। তখন এই সর্বজনীন-বিজ্ঞানভিত্তিক-সেক্যুলার-একই পদ্ধতির-গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্লোগান নিয়ে আসে। এই যে আনল, এগুলো কথার অর্থে, শব্দের অর্থে কেউ কিছু শোনেনি–একথা আমি বলছি না। কিন্তু এভাবে articulate করে, সুন্দরভাবে গুছিয়ে শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্র ফ্রন্ট-ই এনেছে। এটা আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তা থেকে পেয়েছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের একজন বিপ্লবী, ভারতের সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক সংকট-সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করে আজকের দিনে বিপ্লবী সংগ্রামের পথনির্দেশ করেছেন। তাঁরই শিক্ষা থেকে আমরা এই কথাগুলি নিয়েছিলাম।

আমাদের দেশে যত সমস্যা–অপুষ্টি, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি সবকিছু এই পুঁজিবাদী সমাজ সৃষ্টি করেছে। এই ব্যবস্থা এটা করতে বাধ্য, কেননা continuously মানুষের যা প্রয়োজন, তা সে meet করতে পারবে না। মানুষের প্রয়োজনের সাথে

এটি বিরোধাত্মক অবস্থানে থাকবে। এইরকম একটা ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যবস্থা এখানে চলছে। নানা অসঙ্গতি দেখার পরও যেন কোনো কিছু নিয়ে আমরা না ভাবি, সেজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিচ্ছে। অল্প বয়সেই যুবক-যুবতীদের মধ্যে যেসব বিষয়ের উপর আকর্ষণ তৈরি করলে সামাজিক দায়িত্ব-মূল্যবোধ ধারণ করতে অনীহা তৈরি হবে, সে সকল বিষয়ে আকর্ষণ তৈরি করছে। মানুষকে তাদের দাসানুদাস বানিয়ে রাখার জন্য, কর্মস্থলে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য চিন্তা-ভাবনার উপর কর্তৃত্ব করছে। যেমন অল্প বয়সে, puberty-তে যদি কেউ যৌন চিন্তা-ভাবনায় পাগল হয়ে ওঠে, তখন কী হয়? তাহলে নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সামাজিক চিন্তা-ভাবনা করার কোনো অবসর থাকে না এবং ক্রমাগত এসব চর্চার মধ্যে নীতি-নৈতিকতার বোধটুকুর অবসান ঘটে যায়। এভাবে যখনই মানুষ সমাজের সঙ্গে তার বিপরীতধর্মী কোনো ক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়, তখনই তা বিকৃতি রূপে আসে। আবার কোনকিছুই মানবো না–এরকম মনোভাব তৈরি হয়। আজকাল তথাকথিত আধুনিক মানুষেরা মনে করছেন, তারা কিছু মানবেন না, স্বাধীন মানুষ হয়ে যাবেন। কিন্তু সমাজকে বাদ দিয়ে কেউ স্বাধীন মানুষ হতে পারে না। সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি করে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা অর্জন করে। মূল্যবোধহীন মানুষ কোনোদিন স্বাধীন হতে পারে না।

তাই পুঁজিবাদ তার বাঁচার স্বার্থে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও আন্দোলনের উপর আক্রমণ-দমন-পীড়ন নামিয়ে আনছে। কিন্তু তা দিয়ে মানুষের লড়াইকে ঠেকানো যায় না। মানুষ বারবার বিদ্রোহ করে। মানুষের বাঁচতে চাওয়াকে তো কেউ আটকে রাখতে পারবে না। ফলে একসময় দম বন্ধ হবার উপক্রম হলে আবার লড়াই করবে মানুষ। এই অন্তরঙ্গ মুক্তির আকুতি নিয়ে মানুষ লড়বে। এই মানুষকে অমানুষ, হৃদয়কে অনুভূতিহীন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের এই সর্বাত্মক আগ্রাসী, বিকৃত রূপটিকে বলা হয় ফ্যাসিবাদ। এটি মনুষ্যত্বকে একদম গোড়া থেকে নষ্ট করে দিতে চায়। এখানেই নিহিত আছে সবচেয়ে ভয়াবহ সর্বনাশের আশঙ্কা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা পরিকল্পনা-পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করে এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ মানবতার চরম শত্রু হিসেবে ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একদল লোক আছেন, যাঁরা প্রশাসনের উগ্র মূর্তিটাকেই ফ্যাসিবাদ বলেন, একনায়কত্বকেই ফ্যাসিবাদ বলেন। মনে রাখা দরকার একনায়কত্ব–মিলিটারি একনায়কত্ব হয়, একনায়কত্ব 'ক্যু'র (আচমকা অভ্যুত্থানের)

দ্বারাও তৈরি হয়। তাছাড়া, অত্যাচার সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী প্রশাসন ব্যবস্থাতেই হয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা করে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ তার চেয়ে দুর্ধর্ষ। শুধু অত্যাচার একটা দেশের এত ক্ষতি করতে পারে না। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটি সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোক মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, অর্থাৎ দেশে একদল টেকনোক্র্যাট (শিক্ষিত কারিগর) সৃষ্টি করে–যারা মানবিক লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি যাদের কোনও দায়িত্ববোধ নেই, যারা চাকরিকে এবং গোলামিকেই সর্বস্ব বলে মনে করে, পয়সার বিনিময়ে তারা যা কিছু করতে পারে এবং এইভাবে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিদ্যাকে তারা প্রবাহিত করে। অপরদিকে যত অধ্যাত্ম্যবাদ, সেকেলে যত রকমের কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা এবং অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্ম্যবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।[১] ... মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাঁধা সৃষ্টি করে।[২]" *[১.শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট), পৃ. ৩২৯; ২. ঐ, পৃ. ৩৩৩]*

বন্ধুগণ, আপনাদের প্রতি আবেদন করছি, ভবিষ্যতে আপনারাই দেশের দায়িত্ব নেবেন। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে বুঝবার জ্ঞান দরকার। এটা যে একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র–এটা নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যেও বিরাট বিভ্রান্তি আছে। দেখুন একটা দেশে যথার্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করা না যায়, তাহলে শত্রু চিনতে ও মিত্রের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা তৈরি হয়। ফলে যথার্থভাবে এই দেশটা কী, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে বোঝার দরকার আছে। যদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হয়, তাহলে এটা বুঝতে হবে, বিশ্বে পুঁজিবাদ বিকশিত হবার আর কোনো রাস্তা নেই। মনুষ্য বিধ্বংসী এই সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য সঠিক বিপ্লবী রাজনীতি, সঠিক রাজনৈতিক লাইন আয়ত্ত করার জন্য আমি সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

*[২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত শিক্ষা কনভেনশনে প্রদত্ত বক্তব্য। প্রকাশিত: অনুশীলন, অক্টোবর ২০১৪]*